ফাঁসি সেলে বিলু

সতীনাথ ভাদুড়ী

লেখক পরিচয়

[১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ২৭ শে সেপ্টেম্বর পূর্ণিয়ায় সতীনাথের জন্ম হয় । পিতার নাম ইন্দুভূষণ । পাটনা থেকে কলেজের পাঠ শেষ করে ১৯৩২ খ্রীঃ থেকে ১৯৩৯ খ্রীঃ পর্যন্ত পূর্ণিয়ায় ওকালতি করেন । পরে ওকালতি ত্যাগ করে সাধারণ কর্মীরূপে কংগ্রেসে যোগ দেন । ১৯৪০-৪১ খৃঃ ও পরে ১৯৪২-৪৪ খৃঃ পর্যন্ত রাজনৈতিক বন্দী হিঁসেবে ভাগলপুর জেলে আটক ছিলেন । এই সময় রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত 'জাগরী' উপন্যাসটি তাঁকে সাহিত্যিকরূপে পরিচিত করে । ১৯৪৮ খৃঃ-এ কংগ্রেস ত্যাগ করে সমাজতন্ত্রী দলে যোগ দেন । ইনি নানা ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন । এঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ 'ঢোঁড়াই চরিত-মানস', (২টি খণ্ডে), 'চিত্রগুপ্তের ফাইল', 'পত্রলেখায় বাস', 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী' প্রভৃতি । ১৯৫০ খ্রীঃ-এ ইনি 'জাগরী' উপন্যাসটির জন্য 'রবীন্দ্র পুরস্কার পান ।' ১৯৬৫ খ্রীঃ-এ সতীনাথের মৃত্যু হয় ।]

একটি আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করিয়াছি রাজবন্দী দিগের মধ্যে । যে রাজনৈতিক কয়েদী দেশের জন্য নিজের স্বার্থ ও নিজের ভবিষ্যৎ সকলই জলাঞ্জলি দিয়াছে, যে স্বদেশের জন্য হাসিমুখে সর্বদা মৃত্যু বরণ করিতে প্রস্তুত, তাহাকেও জেলের মধ্যে সামান্য স্বার্থের জন্য জঘন্য নীচ মনের পরিচয় দিতে দেখিয়াছি। কমরেড ভোলা ফাঁসির সাজা হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে, কিন্তু কয়েকটি মোকদ্দমা মিলাইয়া মোট তেত্রিশ বৎসরের শাস্তি হইয়াছে । অসম্ভব ফুর্তিবাজ, সর্বদা হাসিমুখ, –ফাঁসির সাজা হইলেও নিশ্চয়ই মুখের কোণের হাসিটি লাগিয়াই থাকিত, –যে কাজে যত বিপদ তাহাতে তাহার তত আনন্দ বেশি । এই বালকের মতো সরল একনিষ্ঠ স্বদেশ-প্রেমীটির ভাবিবার ক্ষমতা অল্প কিন্তু হুকুম তামিল করিতে সে দ্বিধাহীন । এই কমরেডকেও দুই নম্বর ওয়ার্ডে থাকিবার সময় ডালের লঙ্কা লইয়া কালেশ্বর প্রসাদের সহিত মাথা ফাটাফাটি করিতে দেখিয়াছি ।

রাজবন্দীদের এই সকল দুর্বলতা নিত্য জেল-কর্মচারীদিগের নজরে পড়ে । দেশের লোক রাজবন্দীদিগকে যে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখে জেলের কর্মচারীগণ কেমন করিয়া দৃষ্টিতে উহাদের দেখিবে? এই জন্যই বোধ হয় দেশের লোকের প্রশংসাতীত উহাদের প্রশংসার জন্য আমি এত লালায়িত ।...জেলর একদিন সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে বুঝাইতেছিলেন যে, নয় ও দশ নম্বর সেলের কয়েদীরা খুব ভালো; 'They never grouse and grumble'– ইহাই উহাদের প্রশংসার মাপকাঠি ।... সুপারিন্টেণ্ডেন্ট যখন সেদিন আমাকে প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন তখন জেলরবাবু একটি পকেটবুক খুলিয়া, ফাউন্টেনপেন লইয়া আমি কী চাই তাহা নোট করিতে একেবারে প্রস্তুত হইয়াছিলেন । ভদ্রলোকটিকে খুব হতাশ করিয়াছি । সেলের বাহিরে যেখানে কুঁজাটি আছে ঠিক সেইখানে জেলরবাবু সেদিন দাঁড়াইয়া ছিলেন ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. লেখক রাজবন্দীদের মধ্যে কোন্ জিনিস লক্ষ্য করেছেন ?
2. রাজবন্দীদের কোন দুর্বলতা জেল কর্মচারীদের নজরে পড়ে ?

... ঘরের বাহিরে দরজায় সম্মুখে একটি কুঁজায় জল থাকে । এটি কিন্তু বাহিরে থাকে, আমাকে আত্মহত্যার হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য নয়; সেলের সকল কয়েদীকেই ইহা হইতে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়– অবশ্য নয় নম্বর ও দশ নম্বর বাদে যাহার তৃষ্ণা পায় সে সিপাহীজীকে ডাকে । না হয় সেলের ঘন্টা বাজায় । সিপাহীজী নিজের ইচ্ছা ও অবকাশ মতো উঠিয়া তাহাকে জল দেয় । সাধারণত যে যখন জল চায় সে তখনই জল পায় না । অনেকের কাকুতি মিনতি যখন একসঙ্গে বেশ মুখর হইয়া উঠে, তখন সিপাহীজী উঠিয়া কুঁজো হইতে জল গড়াইয়া দেয় । এক নম্বর সেলের বিশেষ খাতির, সেইজন্য আমার দরজার সম্মুখে কুঁজোটি রাখা থাকে। কুঁজোর নলটি গরাদের ভিতর দিয়া টানিয়া লইয়া গ্লাসে জল গড়াইয়া লইলাম যতদূর পারি জল গরাদের বাহিরে ফেলিতে চেষ্টা করিয়া, মুখেচোখে জল দিয়া রইলাম। মুখচোখ দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছিল । সেলে মালী নাই এই দরজার নিচ দিয়াই জল বাহিরে যাইবার কথা । মুখচোখ ধুইবার সময় জল বেশির ভাগ ভিতরেই পড়িল। কুলকুচা করিয়া বাহিরে ফেলিলাম -- দেওয়াল আর মেঝের সংযোগস্থলের সেই ছোট গাছটির উপর । এই গাছটিতে কুলকুচা করিয়া আমি প্রত্যহ জলসিঞ্চন করি । প্রতিবারই যখন কুলকুচা করি, কতদূরে ফেলা যায় তাহার পরীক্ষা করি । মোটামুটি এ সম্বন্ধে ধারণা হইয়া গিয়াছে দাঁড়াইয়া বসিয়া, মুখে ভঙ্গি বদলাইয়া, কত রকমের নিজের সহিত প্রতিযোগিতা করি । রেকর্ড ভাঙিবার চেষ্টা করি । দ্বিপ্রহরে যখন বাহিরে সিমেন্টের মেঝে তাতিয়া আগুন হইয়া থাকে তখন কুলকুচা করিয়া তাহার উপরে ফেলি।

> **পড়ে কী বুঝলে ?**
> 1. কয়েদীদের পানীয় জল কোথা থেকে সরবরাহ হতো ?
> 2. নয় ও দশ নম্বরের কয়েদীদের পানীয় জলের ব্যবস্থা কী ছিল ?

তাহার পর এক দুই করিয়া গনিতে থাকি, কতক্ষণ জল নিশ্চিহ্ন হইয়া শুকাইয়া যায় । কী গাছ জানি না, তামাটে রঙ-এর পাত'। পাতাগুলি নিমের পাতার মতো দেখিতে । লণ্ঠনটি কাছেই থাকায় গাছটি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে । ছোট লতানে গোছের গাছ, দেওয়ালটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে । লণ্ঠনের আলোতে ছোট ছোট হল্‌দে ফুলগুলিকে দেখা যাইতেছে না । কী বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা গাছটির! ইট আর সিমেন্টের মধ্যে ফাটল । তাহারই মধ্য দিয়া ইহা জীবনী-শক্তি আকর্ষণ করিয়া লইতেছে, আমার অবর্তমানেও লইতে থাকিবে । আমার কুলকুচার জলের প্রত্যাশা সে রাখে না । গাছটির দিকে তাকাইলে মনে হইতেছে উহার ডাঁটা ভাঙিলেই সাদা ঘন দুধের মতো রস বাহির হইবে । ক্ষেতপাঁপড়া, যাহাকে আমরা বলি ক্ষীরুয়া তাহার রসও ঠিক এইরূপ দেখিতে । ... সেই রস জ্যাঠাইমা আমার কণ্ঠার নিচে একটি ফোড়ার উপর লাগাইয়া দিয়াছিলেন, ফোড়া ফাটাইবার জন্য । তাঁহার ঘর হইতে দুর্গাদির খেলাঘরের জন্য একটি পুরাতন মাটির প্রদীপে আমি আর নীলু কতদিন ক্ষীরুয়ের দুধ সংগ্রহ করিয়াছি।

ঝর্ণাদির ছোট বোন টেপী, আধময়লা ফ্রক পড়া, মাথায় বেড়া বিনুনি । আমি আর নীলু তাহাকে আশ্রমের কাছে গ্যাঞ্জেস দার্জিলিং রোডের উপর রবার গাছের নিচে লইয়া গিয়াছিলাম কেমন করিয়া রবারের রস জমাইয়া রবার তৈয়ারী করিতে হয় তাহা দেখাইবার জন্য । আমি গাছে উঠিয়া ছুরি দিয়া একটি ডালের উপরের ছাল কাটিয়া দিলাম । টপটপ করিয়া দুধের মতো রস পড়িতেছে; নীলু টেপীকে ধরিয়া তাহার নিচে দাঁড় করাইয়া দিল । বলিল, উপরে তাকাস না, খবদ্দার ! তোর মাথার উপর ইরেজার তৈরি করে দিচ্ছি ।' পরে টেপী বেচারির কী কান্না ! রবারের রস জমিয়া তাহার মাথার চুল কামড়াইয়া ধরিয়াছে । মার কাছে আমরা দুই ভাই সেদিন কী প্রহারই খাইয়াছিলাম ! ভাগ্যিস বাবা 'দেহাত' গিয়াছিলেন । তাহার মাসখানেক পরেই টেপী মারা যায় । আমার আর নীলুর তাহার পর কী মানসিক দুশ্চিন্তা ! কী অনুশোচনা ! আশ্রমের শিশুগাছের তলায় বসিয়া আমরা ঠিক করিয়াছিলাম, রবারের রস মাথায় দিয়াই তাহা ডিফ্‌থিরিয়া হইয়াছে । নীলু আমার আগেই খবর আনিয়াছিল, কার্তিক ডাক্তার টেপীর গলা কাটিয়া তাহার মধ্য হইতে রবারের রস বাহির করিয়াছে । ··· দুর্গাদির বাড়ির সব ছেলেপিলেদের, মা সেদিন আমাদের আশ্রমের বাড়িতে লইয়া আসিয়াছিলেন । টেপীর ভাই ভোঁদা, এই বৎসর উকিল হইয়াছে, তখন সে কত ছোট । মা'র কাছে শুইয়াছিল । রাত্রে বাড়ি যাওয়ার বায়না ধরিয়া কী কান্না ! ···

> **পড়ে কী বুঝলে ?**
> 1. টেপির ভাই একবার মার কাছে কেন মার খায় ?
> 2. লেখকের দৃষ্টিতে 'পি-ডব্লু-ডির' কর্মনিষ্ঠার সাক্ষ্যের একটি পরিচয় দাও।

দরজার সম্মুখে বসিবার উপায় নাই, জলে ভিজিয়া গিয়াছে । নীল ডোরা-কাটা ইজারটি দিয়া জল মুছিয়া লইলাম । ইজার ময়লা হইলেও আর ক্ষতি নাই । কাল তো আর ওটি পরিতে হইবে না । নয় বৎসর আগে ভূমিকম্পের সময় মেঝেতে এই স্থানে গর্ত হইয়া গিয়াছে। আজ পর্যন্ত সেই অবস্থাতেই রহিয়া পি. ডব্লু -ডি'র কর্মনিষ্ঠার সাক্ষ্য দিতেছে। এক নম্বর সেলে যে থাকে তাহার আবার এত বাছ-বিচার। ফাঁসির মঞ্চ হইতে সর্বাপেক্ষা নিকটে এই ঘর, আর যে আসামীর ফাঁসির দিন সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী তাহারই দাবি এই ঘরের উপর । সেলের সাড়েচার হাজার বাসিন্দার মধ্যে এই ঘরের উপর আমারই দাবি সর্বোচ্চ । পি. ডব্লু. ডি'র লোকেরা ঠিক ভাবিয়াছে—ভিজা মেঝের উপর বসিয়া বাতগ্রস্ত হইতে যতদিন সময়ের দরকার, এ বাসিন্দাকে ততদিন বাঁচিতে হইবে না । আর যদি বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছিঁড়িয়া তাহার 'মার্সি পিটীশন্' মঞ্জুর হইয়া যায়, তাহা হইলে সামান্য রোগের কথা ধর্তব্যের মধ্যে নয় । আজিকার দিনেও কিন্তু মনে হইতেছে, এই ভিজার উপরে বসিয়া অসুখ করিতে পারে । একটা গল্প পড়িয়াছিলাম,— একজন লোক আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত। বিষের শিশি মুখের কাছে লইয়া গিয়াছে । হঠাৎ তাহার বন্ধু বাহির হইতে ইহা দেখিয়া, পিস্তলটি তাহার দিকে নিশানা করিয়া বলিল, 'ফেলে দে বলছি গেলাসটা, না হলে এখুনি গুলি করলাম ।' হাত হইতে গ্লাস পড়িয়া গেল । কে বুঝিতে পারে মনের এই গতি !

হয়তো দরজার সম্মুখের এই গর্তটি ভূমিকম্পের পর মেরামতের সময় নজরে পড়ে নাই । এন্‌জিনিয়ারের বিশেষ দোষ নাই । হঠাৎ নজরে পড়ে না । কাছাকাছি জল পড়িলে সব জল ঐ স্থানে জমা হয়— তখন বুঝা যায়—ঐ স্থানে একটা গর্ত ।··· কী কাণ্ড সেবার ভূমিকম্পের সময় ! ১৯৩৪ সালের ভূমিকম্পের কথা বলিতেছি । — পাটনা ক্যাম্প জেল হইতে উত্তর বিহারের সকল রাজবন্দীকে গভর্ণমেন্ট ছাড়িয়া দিল—ভূমিকম্পপীড়িত জনগণের জন্য । নীলু ১৯৩২-এর শেষের দিকেই ছাড়া পাইয়াছিল । বাবা, মা দুজনেই জেলে । নীলু জ্যাঠাইমাদের বাড়িতে থাকিয়া পড়ে । আমরা বি. এন. ডব্লু রেল দিয়া আসিতেছি । প্রতি স্টেশনেই ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলার চিহ্ন বিদ্যমান । 'পথ্‌হারা' না কোন স্টেশনের কাছে একদিন বসিয়া থাকিতে হইল । পুল ভাঙিয়া গিয়াছে । নৌকায় পার হইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে তিনআনা খোরাকি পাওয়া গিয়াছিল । সেই নদীর ধারের হাটে, দইওয়ালার সহিত 'ঠিকা' হইল চার পয়সায় যে যত দই খাইতে পারে । নগিন্দর সিং প্রায় চার-পাঁচ সের দই

খাইল, – বিনা মিষ্টিতে লালচে রঙ-এর মহুয়া দই । সঙ্গে পয়সা নাই । কারাগোলারোড স্টেশন হইতে পূর্ণিয়া পর্যন্ত হাঁটিয়া যাইতেই হইবে । গ্যাঞ্জেস-দার্জিলিং রোডে কী বড় বড় ফাটল ! হরদার পুলটি ভাঙিয়া গিয়াছে । হরদা বাজারের নিকট গিয়া পা আর চলে না । দুবেজী কংগ্রেসকর্মী । তাহার দোকানে উপস্থিত হইতেই তাহার স্ত্রী দৌড়াইয়া ভিতরে চলিয়া গেল । অল্পক্ষণ পরেই 'পরণাম' এই কথা বলিতে বলিতে বাহির হইয়া আসিল । দেখিলাম মিলের শাড়ি বদলাইয়া সবুজ পাড়ের খদ্দরের শাড়িখানি পরিয়া আসিয়াছে । গায়ের রঙ এত বয়স সত্ত্বে সুন্দর ফুটফুটে,– ঋজু দেহ, টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো বাঁকা নাকটি – সর্বোপরি চোখমুখের একটি আত্মমর্যাদার ভাব বৃদ্ধার রূপকে আরও শ্রীময়ী করিয়া তুলিয়াছে । দুবেজীর স্ত্রী ও দুবেজী কী খাতিরটাই করিল ।– দুধে চিঁড়ে ভিজাইয়া সে চিড়া দই দিয়া আমরা রঙ্গ-কৌতুকের মধ্যে তৃপ্তি করিয়া খাইলাম । কৌতুকের লক্ষ্য দুবেজী । সকলেই তাহার ভোজপুরী বুলি অনুকরণ করিয়া কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছে । দুবেজী পৌঁছাইলাম' কে 'চৌপল' বলেন, তাহা লইয়া কী হাসি ! বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাও এই হাসিতে যোগ দিয়াছে । আগুনের 'ঘুরের' ধারে অনেক রাত্রি পর্যন্ত দুবেইনের সহিত গল্প হইল–মা'র কথা– এইবার সাদি করিতে হইবে–আরও কী কী মনে পড়িতেছে না। দুবেইন 'নিমক সত্যাগ্রহের' সময় লবণ তৈয়ার করিয়া জেলে গিয়াছিল । কিন্তু পুলিস কেন জানি না, দুবেজীকে ধরে নাই, বোধ হয়, বয়স হইয়াছে বলিয়া । তাহার পর হইতে 'দুবেইন' নিজেকে দুবে অপেক্ষা বড় বলিয়া মনে করে- -দুবেজী আমার কাছে এই সব নালিশ করিল । ভারি সরল মন, এই স্বামী স্ত্রী দুই জনের । নিজেদের সামান্য জমি-জমা যাহা ছিল কংগ্রেসকে দান করিয়াছে । রাত্রিতে শুইয়া আছি, উহারা মনে করিল আমরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছি । পাছে অমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, আমাদের কম্বলের উপর আর একখানি করিয়া কম্বল চাপা দিয়া গেল । তাহার পর ঐ স্থান হইতে রওনা হইবার পূর্বে স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলের দিকে আমাকে একান্তে লইয়া গিয়া বিলল, 'আমাদের একটি অনুরোধ রাখতে হবে । আমাদের ছেলেপিলে নেই । তোমাকে কতদিন থেকে সেই যখন তুমি এতটুকু ছিলে, তখন থেকে দেখছি । মাস্টার সাহেবের ছেলে তো আমাদেরও ছেলে । আমরা গরিব মানুষ, তোমরা হলে বাঙালী, বিলুবাবু । কিন্তু আমাদের একটি কাজের দায়িত্ব তোমাকে নিতেই হবে। আমাদের যে কয়েক বিঘা জমি আছে, তাহার আয় আমি কংগ্রেসের কাজেই খরচ করি । এগুলো লেখাপড়া করে দিয়ে যেতে চাই । আমরা মরে যাবার পর তুমি এগুলো মহাত্মাজীর কাজে লাগিও । আমরা আর কটা দিনই বা বাঁচব ? তাহাদের

পড়ে কী বুঝলে ?

1. বিহারে ভূমিকম্প কবে হয় ?
2. ভূমিকম্প পীড়িতদের সেবার জন্য নীলু কবে ছাড়া পেয়েছিল ?

কাছে কথা দিয়াছিলাম । দুবেইন এখনও বোধ হয় সেই রঙীন কাগজের রথের মধ্যস্থিত রামজীর 'মুরতের' সম্মুখে বসিয়া, প্রদীপের আলোয়, তকলিতে এন্ডির সুতা কাটিতেছে ।

... হরদাবাজার হইতে পূর্ণিয়া পৌঁছিলাম পরের দিন দুপুর বেলায় । 'গান্ধী আশ্রম' গভর্ণমেন্ট 'জপতো' করিয়াছে । তথাপি সেই দিকেই চলিলাম ।... দূর হইতে দেখিতেছি, জেলা কংগ্রেস অফিসঘরের পাশের শিশু গাছটি পীতাভ – জরদ রঙ-এর বিগ্নোনিয়া ফুলে ভরিয়া গিয়াছে । আমি সেবার লতাটি ঐ গাছে উঠাইয়া দিয়াছিলাম । পতাকাস্তম্ভের জাতীয় পতাকা পূর্বে বহুদূর হইতে দেখা যাইত । এখন তাহা নাই ! কিন্তু ভাসমান, সাদা মেঘখণ্ডের পটভূমিকায়, বিগ্নোনিয়া ফুলে ভরা 'শিশু' গাছটি জাতীয় পতাকারই কাজ করিতেছে– সাদা, জাফরানী, সবুজ তিনটি রঙ ! ... আশ্রমের বাড়িগুলি খড়ের । আমাদের বাড়ির বেড়া ভাঙিয়া পড়িয়াছে । টিউবওয়েলের উপরের অংশটি নাই । এস ডি. ও. সাহেবের সীল করা দরজায়, তালার চিহ্নমাত্র নাই । তক্তাপোশ ও বড় আলমারিটি ছাড়া আর কোনো জিনিসই ঘরে নাই; ছোটখাট সব জিনিসই যে পারিয়াছে সে-ই লইয়া গিয়াছে । রান্নাঘরের দরজার কপাট দুইটিও কে তুলিয়া লইয়া গিয়াছে । মহাত্মাজীর ছবিখানি চুরি গিয়াছে । ন'দির তৈয়ার করিয়া দেওয়া ফ্রেমে বাঁধানো তুলার পেঁচাটি দেখিলাম না। সহদেওএর বোন সরস্বতীর ছোটবেলার তৈরি কার্পেটের উপর বোনা 'Untouchability is a sin' — 'সিন' এর N টি Z এর মতো করিয়া লেখা—তাহাও নাই । আমার লেখা একটি কবিতা নীলু পেস্টবোর্ডের উপর আঁটিয়া টাঙাইয়া দিয়াছিল—সেইটি রহিয়াছে । লেখা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে । আর আমারই আঁকা রবিবাবুর ছবি, পিজবোর্ডের উপর আঁটা, এখানিও দেখিলাম কেহ লইবার যোগ্য দ্রব্য বিবেচনা করে নাই । হয়তো ফ্রেমে বাঁধানো নয় বলিয়া ছাড়িয়া গিয়াছে । ফুলের গাছগুলি চুরি হইয়া গিয়াছে । কেবল গোলাপী আর সাদা তিনকা ফুলে আঙিনাটি ভরিয়া রহিয়াছে । বোধ হয় উহার গাছ ছাগলে গোরুতে খায় না । মধ্যে মধ্যে দুই একটা ভ্যারেণ্ডার গাছ মাথা উঁচু করিয়া রহিয়াছে, আভিজাত্যহীন নগণ্য তিনকাকে তাচ্ছিল্য করিবার জন্য । গুটিপোকার চাষের বাড়ি একেবারে পড়িয়া গিয়াছে । গোরুর গাড়ির চাকা দুইটি কে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে । তেলের ঘানির ঘরটি খাড়া আছে । কিন্তু ঘরের ভিতরটি অড়র গাছের মতো দেখিতে একপ্রকার আগাছায় ভরা । ভিতরে যাইবার উপায় নাই । আশ্রম লাইব্রেরির বই একখানিও নাই । হলঘরের মধ্যে দেখিলাম রাশীকৃত আবর্জনা অনেকগুলি ছাগল ও গোরু প্রত্যহ বাঁধিবার চিহ্ন তথায় বর্তমান । প্রতিবেশীরা দেখিতেছি কংগ্রেসের এই দুর্দিনেও ঘরটিকে ভুলে নাই । ...

মন উদাস হইয়া গেল । আশ্রম হইতে বাহির হইয়া জ্যাঠাইমার বাড়ির গেটের মধ্যে ঢুকিলাম।

এটা বাবার অন্তরঙ্গ বন্ধুর বাড়ি । বাড়ির ঠিক সম্মুখে একটি তাঁবু । তাঁবুর দরজার উপর একটি সাদা ছাগল উর্ধ্ব মুখ হইয়া একমনে একটি লতাপাতার এমব্রয়ডারি করা টেবিল ক্লথ চিবাইতেছে । ননীদির মেয়ে বুড়িয়া, আর তাহার খেলার সাথীগণ, মাঠের মধ্য দিয়া যে বিরাট ফাটলটি চলিয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া আছে । আমাকে দেখিয়া সকলে দৌড়াইয়া আসিল । আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'ওখানে কী করছিলি ?' বলিল, 'ছোটমামা বলেছে যে, ফাটলের মধ্যে দিয়ে আমেরিকা দেখা যায় ।' ... বাহির হইতে চিৎকার করিতে করিতে বুড়িয়া বাড়ি ঢুকিল– 'দিদিমা দেখ, কে এসেছে।' জ্যাঠাইমা আর ন'দি হবিষ্যি ঘরে খাইতে বসিয়াছেন । 'কোথায় ন'দি' বলিয়া ঢুকিতেই দুইজনেই খাওয়া ছাড়িয়া বাহিরে আসিলেন । জ্যাঠাইমার ডান হাত এঁটো । বাঁ হাত দিয়া আমাকে কাছে টানিয়া লইলেন। নীলু দেখি ঘরের মধ্যেই ছিল । চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বাহিরে আসিল। 'জ্যাঠাইমার খাওয়াটি নষ্ট করলে তো– এখন জ্যাঠাইমার পাতে বসে ওগুলি গেলো'– বলিয়া উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিল । ন'দি বলিল, 'দেখেছ, দেখেছ, আমাদের তো হয়েই গিয়েছিল ।' ন'দির চোখে কপট ক্রোধের চিহ্ন । জ্যাঠাইমা নীলুকে তাড়া দিয়া কহিলেন, তুই আবার ঐ ভাঙা ঘরে শুয়েছিলি ! ঘর চাপা পড়ে মরবি না কি ? তোকে নিয়ে আর পারি না । আর আমি তোকে এখানে রাখব না । পাঠিয়ে দেব মামার বাড়িতে। কী ডাকাত ! কী ডাকাত ! কাল রাতেও ঐ আটফাটা ঘরে শুয়েছিল !' তারপর কত কথা, কত গল্প !

পড়ে কী বুঝলে ?

1. আশ্রমে কোন কোন জিনিস চুরি হয়েছিল ?
2. আশ্রমে কোন জিনিসগুলি চুরি হয়নি ?

নীলুর কথাই ফলিল । সেই পাতেই আমাকে খাইতে হইল । আমরা কখনও জ্যাঠাইমাদের বাড়িকে নিজেদের বাড়ি ছাড়া ভাবিতে পারি নাই । জ্যাঠাইমাদের বাড়ি চিরকাল আমাদের 'ও বাড়ি' ।

জ্যাঠাইমাকে মনে পড়ে – সম্মুখের দুইটি বড় বড় দাঁত মুখের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে । কপালে দুই ভ্রূর মাঝে একটি নীল উল্কার দাগ । মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, ছোট্ট মুখখানি । মুখে হাসি লাগিয়াই আছে । আর হাসিলেই দেখা যায় সম্মুখের নিচের পাটির দাঁত পড়িয়া গিয়াছে । পরনে মটকার থান । জ্যাঠাইমার চোখে মুখে কথাবার্তায়, এমন মাতৃত্বের ভাব যাহা সচরাচর দেখা যায় না । রাফায়েলের মাতৃমূর্তি বড় গম্ভীর, কেমন যেন একটু আড়ষ্ট আড়ষ্ট ভাব; সর্বশরীরে সাবলীল ছন্দ ও স্বচ্ছন্দগতির অভাব; হাসপাতালের নার্সদের মেট্রনের মতো যেন কৃত্রিম গাম্ভীর্যে ভরা; কিন্তু জ্যাঠাইমা যেন দেশী পটুয়ার আঁকা যশোমতীর ছবি, – চাকচিক্য নাই কিন্তু অন্তরে সাড়া দেয়া আমার মা'র যে-ভাব আমার আর নীলুর প্রতি, জ্যাঠাইমার সেই ভাব পাড়ার সব ছেলেমেয়ের প্রতি । সকলেরই এখানে অবারিত দ্বার; কিন্তু আমার গর্ব যে আমার

স্থান তাহাদের মধ্যে সর্বোচ্চে । নীলুরা তো যখন-তখন জ্যাঠাইমাকে এই বলিয়া ক্ষ্যাপায় যে তিনি আমার উপর পক্ষপাতিত্ব করেন; আর সকলকে না দিয়া, লুকাইয়া আমার জন্য খাবার রাখিয়া দেন। আমি জেলে থাকি সে সময় জ্যাঠাইমা একবার খুব অসুখে পড়েন । সেই সময় নাকি তাঁর সব সম্পত্তি আমাকে দিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন । তখন দেখা যায়, তাঁর নিজের সম্পত্তির মধ্যে আছে একটি পুরনো বালিশের ওয়াড়ের মধ্যে ছাব্বিশটি টাকা,– আর এক কলসী পুরনো ঘি– প্রতিমাসে কিছু কিছু করিয়া জমানো । নীলু রসাইয়া এই সকল গল্প করে এবং যখন-তখন জ্যাঠাইমাকে এই জন্য উদ্ব্যস্ত করিয়া তোলে ।

... সেই একবার জ্যাঠাইমার ভাইয়ের নাতনীর বিয়েতে জ্যাঠাইমাকে লইয়া গিয়াছিলাম তাঁহাদের দেশে । পাবনা জেলার ছোট একটি গ্রাম; যমুনা নদীর তীরে । জ্যাঠাইমার সঙ্গে তাঁহাদের গ্রাম দেখিতে বাহির হইয়াছি । তাঁহার কবিরাজদার ভিটে, গ্রামের বাবুদের ভাঙা মন্দির; ভৈরব ভূঁইয়া – যাঁহার নামে শুকনো গাছে ফল ধরিত, বাঘে - গরুতে একঘাটে জল খাইত, তাঁহাদের প্রাচীন বসতবাটী; আরও কত জায়গা দেখিলাম । জ্যাঠাইমার কাছে বাল্যকাল হইতেই এই সকল স্থানের এত গল্প শুনিয়াছিলাম যে, কিছুই যেন নূতন লাগিতেছিল না । তাহার পর জামাইদীঘির ধারের বাঁধের উপর দিয়া যাইতেছি,– জ্যাঠাইমা দেখাইলেন, এইখানে নবদ্বীপ ডাক্তার সাইকেল হইতে পড়িয়া গিয়াছিল । 'তখন এ জেলায় একখানি মাত্র সাইকেল ছিল । সাইকেল দেখবার জন্য আমরা পাড়ার সবাই এখানে এসে দাঁড়িয়েছি–বেচারা হুড়মুড় করে পড়ে গেল দীঘির জলের ভিতর, একেবারে সাইকেল-টাইকেল নিয়ে!' আমি বলিলাম, 'জ্যাঠাইমা, সে যে বলেছিলে ফেরিমেন্টের রাস্তার (আসলে কথাটি Ferry Fund) উপর ।' 'আরে ! এই বাঁধের উপর দিয়ে এইটাই ফেরিমেন্টের রাস্তা । আর দ্যাখ, তোকে একটা কথা বলি; বোস এখানে । তুই যে আমাকে জ্যাঠাইমা, জ্যাঠাইমা বলে ডাকিস, আমার একটুও ভালো লাগে না । আমাকে মা বলতে পারিস না !' আমি কেমন যেন হতভম্ব হইয়া গেলাম । তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখি, আগ্রহান্বিতভাবে, জিজ্ঞাসু নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, আমার উত্তরের প্রতীক্ষায় । প্রগাঢ় স্নেহপূর্ণ মাতৃত্বের ঝলকে মুখ উদ্ভাসিত । প্রশ্নটি এত অপ্রত্যাশিত যে আমার মুখে উত্তর জোগাইতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগিল । ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলাম, 'জ্যাঠাইমাও যা মাও তাই। দুই-ই তো একই ।' দেখিলাম আমার উত্তরে তিনি বিলক্ষণ অপ্রস্তুত হইয়াছেন । অপরাধীর সুরে বলিলেন, 'তোর মা আছে; তোকে এই অনুরোধ করা আমার অন্যায় হয়েছে !' তাঁহার দৃষ্টি দীঘির অপর পারে, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট জিনিসের উপর নয় ।...

সেই দিন হইতে অপর সকলের অসাক্ষাতে জ্যাঠাইমাকে 'মা' বলিয়া ডাকি । সকলেই কথাটা জানে, কিন্তু তথাপি 'জ্যাঠাইমা' ডাকে ছোটবেলা হইতে এমন অভ্যস্ত যে, সকলের সামনে 'মা' বলিয়া ডাকিতে কেমন যেন সংকোচ হয় । নবদ্বীপ ডাক্তারের সাইকেল হইতে পড়িয়া যাইবার স্থান দেখাইবার সময় জ্যাঠাইমার হঠাৎ আমার মা হইবার ইচ্ছা কেন হইল, তাহা আজও ঠিক করিতে পারি নাই ।...

... ইহার কিছুদিন পরের কথা . যাহা ভয় করিয়াছিলাম ঠিক তাই । আমার জ্যাঠাইমাকে 'মা' বলা, মা পছন্দ করেন না । আমি আর নীলু রান্নাঘরের দাওয়াতে খাইতে বসিয়াছি । মা পরিবেশন করিতেছেন । পরিবেশন করিয়া মা আমাদেরই সঙ্গে খাইতে বসিবেন । আমি হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম, 'মা, জানো জ্যাঠাইমা তিলবাঁটা দিয়ে একরকম এমন সুন্দর ঝিঙের ঝোল রাঁধেন ।' তা সেখানে খেলেই পারো । এখানে আর খাওয়ার দরকার কী ?' কী কথার কী উত্তর ! মা স্বভাবতই মিষ্টভাষিণী। তাঁহার কথার এই আকস্মিক ঝংকার আমাকে অবাক করিয়া দিয়াছিল । নীলু হঠাৎ বলিয়া উঠিল, 'আজকে মাকে বলেছি কিনা যে, তুমি জ্যাঠাইমাকে মা বলো, তাই মা চটেছে । দেখলে না তুমি বললেন ।' সত্যই মা বেশি রাগ করিলে আর আমাদের 'তুই' বলেন না । নীলুটাও আবার এমন বোকা; মা'র আড়ালে খবরটি আমাকে দিলেই পারিত । দেখিলাম মা'র দু'চোখ দিয়া জল আসিতেছে, তাহা ঢাকিবার জন্য রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন । আমার মনে হইতে লাগিল যে একটি গুরুতর অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছি।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. জ্যাঠাইমাকে বিলু কী বলে ডাকত ?
2. নীলুর কিসের অপরেশন হওয়ার কথা ছিল ?

... মা যে ওয়ার্ডে আছেন, তাহার নাম 'আওরৎ কিতা' । আজ আর ঘুমাইতে পারিবেন না । মা বোধ হয় মশারি ফেলিয়া জপে বসিয়াছেন । মন খারাপ হইলেই মা দেখিয়াছি জপে বসেন । নীলু যখন দেউলীতে গত বৎসরের প্রথমের দিকে অসুখে পড়িয়াছিল, তখনকার কথা বলিতেছি । হঠাৎ খবর আসিল নীলুর অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশন করা হইয়াছে, আজমীর হাসপাতালে । সেদিন সারারাত মা পূজার ঘরে থাকিলেন। রাত্রি প্রায় এগারো'টার সময় কেবল একবার আমার ঘরে আসিয়া আয়নার পাশে ও তাকের উপর, শিশিগুলির পাশে কিছু খুঁজিতে লাগিলেন । আমার মনে হইল মা হয়তো নীলুর অসুখের সম্বন্ধে আমার সহিত কথা বলিতে চাহেন। অথচ সাহস পাইতেছেন না, পাছে আবার আমি অসুখের গুরুত্ব বা প্রাণে আশঙ্কা সম্বন্ধে কোনো কথা বলিয়া ফেলি সেই জন্য। বোধহয়

জপ করিয়া মনে সম্পূর্ণ বল পান নাই । মা ভাবিলেন আমার দৃষ্টি বই-এর দিকে নিবদ্ধ – তাঁহাকে আমি দেখিতেছি না । দেখিলাম অতি ভক্তিভরে দেওয়ালে টাঙানো গান্ধীজীর ছবিটিকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার আলনায় টাঙানো, গুছানো কাপড়গুলিকে আবার গুছাইতে আরম্ভ করিলেন । তখন আমি মাকে বলিলাম 'অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশন অতি সাধারণ ব্যাপার । সকলেরই সেরে যায় । আজকাল বিলেতে সুস্থ লোকে এই অপারেশন করিয়ে নেয় ।' মা এমন ভাব দেখাইলেন যে এ বিষয়ে তাঁহার কোনো চিন্তা বা ঔৎসুক্য নাই । 'দেউলি থেকে অজমীর কতদূরে রে ?' আবার সারারাত্রি জপেই কাটিল । ...

জেনে রাখো

নৈতিক	—	নীতিগত
দ্বিধাহীন	—	দোনা মোনা না করা, স্থিরনিশ্চয় ।
সম্ভ্রম	—	শ্রদ্ধা ।
নিত্য	—	রোজ
কাকুতি মিনতি	—	আকুল প্রার্থনা, অনুনয় ।
কুলকুচা	—	মুখের মধ্যে জল নিয়ে নাড়াচাড়া করা ।
জল সিঞ্চন	—	জল দিয়ে ভেজানো, জলসেচন ।
দ্বিপ্রহর	—	দুপুর ।
আকাঙ্খা	—	একান্ত ইচ্ছা ।
প্রশংসা	—	ভালো বলা, সুখ্যাতি করা ।
আত্মহত্যা	—	স্বয়ং মৃত্যুবরণ করা ।
রেকর্ড	—	লিপিবদ্ধ করা ।

পাঠবোধ

অতি সংক্ষেপে লেখো

1. এক নম্বরের কয়েদীদের জলের ব্যবস্থা কী ছিল ?
2. দুবেজীর বাড়িতে বিলুকে কী খেতে দেওয়া হয় ?
3. কুঁজোর জল কোথায় রাখা থাকতো ? আর ঐ জলটা কারা ব্যবহার করতো ?
4. জ্যাঠাইমার কী কী সম্পত্তি ছিল ?
5. বিলুর জ্যাঠাইমা কেমন মহিলা ছিলেন ?

সংক্ষেপে লেখো

6. দুবেজী বিলুকে একান্তে নিয়ে গিয়ে কী দায়িত্ব দিতে চেয়েছিলেন ?
7. নীলুর মা কি কথায় রেগে উঠতেন ?
8. নীলুর মার মন খারাপ হলে কী করতেন ?
9. জ্যাঠাইমার চেহারার বর্ণনা দাও ।
10. দুবেজী ও দুবেইনের পরিচয় দাও ।

বিস্তারিতভাবে লেখো

11. এই পাঠের মধ্যে বিলু টেপীর সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলেছে তা বুঝিয়ে লেখো ।
12. ১৯৩৪ খ্রীঃ ভূমিকম্পের সময়কার বিলুর অভিজ্ঞতার বর্ণনা পাঠ অনুসরণ করে লেখো ।
13. পূর্ণিয়ার গান্ধী আশ্রমের দুরবস্থার বর্ণনা করো ।
14. এই পাঠে বিলুর মায়ের যে পরিচয় তোমরা পেয়েছো তা নিজের ভাষায় লেখো ।
15. রাজবন্দীদের সম্পর্কে বিলুর অভিজ্ঞতা নিজের ভাষায় গুছিয়ে লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বাক্য রচনা করো

প্রশংসা, আত্মহত্যা, রেকর্ড, নিত্য, কাকুতি - মিনতি ।

2. **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো**

স্বার্থ, মৃত্যু, হাসি, স্বদেশ, দুর্বল।

3. **সন্ধি বিচ্ছেদ করো**

দ্বিধাহীন, সম্ভ্রম, জলসিঞ্চন, দ্বিপ্রহর, আকাঙ্খা।

4. **বাক্যগুলি চলিত ভাষায় লেখো**

(ক) একটি আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করিয়াছি রাজবন্দীদিগের মধ্যে।

(খ) স্বদেশের জন্য হাসিমুখে সর্বদা মৃত্যুবরণ করিতে প্রস্তুত।

(গ) ফাঁসির সাজা হইলেও নিশ্চয়ই মুখের কোনের হাসিটি লাগিয়াই থাকিত।

(ঘ) যে কাজে যত বিপদ তাহাতে তাহার তত আনন্দ বেশি।

(ঙ) দরজার সম্মুখে বসিবার উপায় নাই, জলে ভিজিয়া গিয়াছে।